আলোকিত মানুষের সান্নিধ্যে

রাহমান মনি

আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে বেশ কিছু বড় মানুষের সান্নিধ্য পাওয়ার সুযোগ হয়েছে। খুব কাছ থেকে তাদের দেখেছি, স্নেহধন্য হয়েছি।

'প্রবাস প্রজন্ম' জাপান আয়োজিত 'দুই প্রজন্মের মিলন মেলায়' আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল এবং ড. ইয়াসমীন হক। বিমানবন্দরে তাদের দুইজনকে অভ্যর্থনা জানানোর দুর্লভ সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক মুনশী খ. আজাদ এবং স্যারের প্রথম ব্যাচের ছাত্র, পরে কলিগ, বর্তমানে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষারত ড. খাদেমুল ইসলামের সঙ্গে আমিও একজন। ফুল হাতে দাঁড়িয়ে আমরা। অপেক্ষার পালা যেন শেষ হতে চায় না। যে লোকটিকে এক নজর দেখার জন্য ২০০৭-এ বইমেলায় কাছেও ভিড়তে পারিনি, অথচ তাকে কাছ থেকে দেখব, হাতে হাত মিলাব। এ অন্য রকম এক অনুভূতি। ভাষায় প্রকাশ করে বুঝাবার নয়।

আমিই প্রথম দেখলাম, দুজনেই এগিয়ে আসছেন। ড. ইয়াসমীন এগিয়ে এলেন। সবাই পরিচিত হলাম। ড. খাদেমুল তাঁর ছাত্র ছিলেন। আমি আজাদ ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় করানোর পর নিজে পরিচিত হলাম। স্যার বললেন, কী খবর মনি সাহেব? আপনার সঙ্গেই তো মুঠোফোনে আমার যোগাযোগ হতো তাই না? কেমন আছেন আপনারা? অনেক কষ্ট করছেন আপনারা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আজাদ ভাইয়ের গাড়িতে চারজন চড়ার পর স্যার আমাকে বললেন, আপনি যাবেন কীভাবে? ম্যাডাম সঙ্গে সঙ্গে বললেন, কেন, উনি আমাদের সঙ্গেই যাবেন। আমরা একসঙ্গেই যাব। স্যার হয়তো মনে করেছিলেন যে আমরা হয়তো ভিন্ন ভিন্ন গাড়িতে করে গিয়েছি। ম্যাডাম বুঝতে পারছিলেন যে, না উনারা একসঙ্গেই এসেছেন। গাড়িতে অনেক কথাই হচ্ছিল। বেশির ভাগই ড. খাদেমুল এবং আজাদ ভাই উত্তর দিচ্ছিলেন।

স্যারের কথা, আমি বাসায় আপনাদের কোনো কষ্ট দিতে চাই না। ফাস্ট ফুডে কোনো আপত্তি নেই আমাদের। তাছাড়া বাসায় যাওয়া আপনাদের পরিবারের ওপর বাড়তি একটি ঝামেলা হবে। আমি বললাম, স্যার আমার বউ নেই। নিজেই সব কিছু করি। কাজেই কোনো ঝামেলাও নেই। আমার রান্না মুখরোচক না হলেও গলাধঃকরণ করা যাবে। উত্তরে স্যার বললেন, আমরাও প্রবাসে জীবন কাটিয়েছি। প্রবাসের সীমাবদ্ধতা জানি। আপনারা আমাদের সম্মান দিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। যাতায়াত এবং থাকার ব্যবস্থা করেছেন। এইটাই আমাদের জন্য অনেক। আমাদেরও কিছু করার সুযোগ দেয়া উচিত। যদিও ইয়াসমীন ম্যাডাম কোনো ধরনের সুযোগই নেননি। এমনকি প্লেন টিকেটেরও।

হোটেল রুম বুঝে নেয়ার পর আগে থেকে অপেক্ষমাণ কাজী ইনসান (সাপ্তাহিক ২০০০ টোকিও প্রতিনিধি এবং সম্পাদক, পরবাস, জাপান) সহ সবাই আমার বাসাতেই রাতের আহার পর্ব শেষ করার পর গল্প-গুজবে মনে হয়নি যে আমরা ড. জাফর ইকবালের সঙ্গে আলাপ করছি। মনে হয়েছে উনি প্রায় প্রতিদিনই আসেন এবং এই বাড়ির আনাচ-কানাচ তাদের পরিচিত। খুব সহজেই এবং স্বল্প সময়ে সব কিছুই আপন করে নিলেন এবং খাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্টের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন।

হিরোশিমা নেমেই প্রথমে যাই মিয়াজিমা দ্বীপে। অপরূপ সৌন্দর্যে ভরা দ্বীপ মিয়াজিমা দুইজনকেই মুগ্ধ করে। তবে স্যার বারবার তাগিদ দিতে থাকেন 'পিস মেমোরিয়াল পার্ক' দেখার জন্য। যাকে জাপানিরা গেন বাকু বলে থাকে। মাত্র দেড় ঘণ্টায় মিয়াজিমা দেখা শেষ। মিয়াজিমা দ্বীপ থেকে ফেরী করে ফিরে ট্রামে চড়ে বসি পিস মেমোরিয়াল পার্কের উদ্দেশে। আমিও ২২ বছর জাপান জীবনে প্রথমবারের মতো পিস মেমোরিয়াল পার্কে যাচ্ছি শান্তি কামনা করতে এবং মৃতদের প্রতি

প্রতিবেদকের সঙ্গে ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল ও তার সহধর্মীনি ইয়াসমিন হক

গভীর শ্রদ্ধা ও আমেরিকানদের প্রতি তীব্র ঘৃণা জানাতে। তিনজনেই শ্রদ্ধা জানালাম অন্তর থেকে। পুরো চার ঘণ্টা ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন স্থান দেখা হলো।

রাত ৮টার ফিরতি ট্রেনে চড়ে আমরা টোকিওর উদ্দেশে রওনা হই। পথে কেবল ৬ আগস্ট ১৯৪৫ সালের সেই ভয়াল দিনের কথা বারবার আলোচনা হয়। কখন যে টোকিও স্টেশনে ট্রেন থামে বুঝতেই পারিনি। যদিও বারবার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। স্টেশনে অপেক্ষায় ছিলেন কাজী ইনসান। গভীর রাতে আমরা হোটেলে পৌঁছি।

১২ নবেম্বর সকালেই স্যারদের হোটেলে চলে আসি। স্যার এবং ম্যাডাম যথাসময়ে প্রস্তুত থাকেন। আকিহাবারা ইলেকট্রনিক্স মার্কেট ঘুরে বেড়াই। বিভিন্ন মার্কেট ঘুরে প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস কিনেন স্যার এবং ম্যাডাম। আকিহাবারা ইলেকট্রনিকস্ মার্কেটকে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ইলেকট্রনিকস্ মার্কেট বলা হয়ে থাকে।

সময় শেষ হয়ে আসে, স্যার বারবার ঘড়ি দেখছিলেন। তাড়া দেন আমাকে। কারণ ৪টার সময় আজাদ ভাইকে সময় দেয়া আছে। আজাদ ভাই স্যারকে নিয়ে যাবেন নাগানো কেন্-এ। সেখানে Japan International Cooperation Agency (JICA) পরিচালিত Komagane Training Center (KTC)-এর পক্ষ থেকে স্যার এবং ম্যাডামকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তাদের কার্যক্রম পরিদর্শন করার জন্য। কিন্তু আমি ভাবি অন্য কথা। আমরা জাপানে থেকেও জাপানিদের মতো সময়কে মূল্য দিতে পারলাম না। অথচ স্যার কি সুন্দর সময়কে মূল্য দিচ্ছেন।

১৪ নবেম্বর স্যার এবং ম্যাডাম ফিরে আসেন JICA পরিদর্শন শেষে আজাদ ভাইয়ের সঙ্গে। Koyo স্টেশন থেকেই স্যারদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় টোকিওর নতুন শহর ওডেইবাতে, সমুদ্রকে কাজে লাগিয়ে কী সুন্দর শহর করা হয়েছে তা স্বচক্ষে দেখানোর জন্য। কোনো রকম ক্লান্তি ছাড়াই মধ্য রাত পর্যন্ত স্যার বিভিন্ন স্থান দেখেন অথচ সঙ্গীদের অনেকেরই ক্লান্ত মুখ দেখা যায়।

পরদিন ১৫ নবেম্বর সকাল ৬টায় বের হতে হয়। কারণ এই দিন স্যারকে Aichi Gakuin University-তে লেকচার দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। রাতেই তিনি টোকিওর উদ্দেশে নাগোয়া ত্যাগ করেন। সময়মতো নির্দিষ্ট স্থানে তাকে রিসিভ করা হয় এবং সেখান থেকে হোটেলে পৌঁছে দেয়া হয়।

১৬ নবেম্বর সকালেই স্যারের রুমে হানা দিই। একসঙ্গে সকালের নাস্তা সেরে NHK তে স্যারের একটি স্বাক্ষাৎকার আছে তাই কাজী ইনসান এবং আমি স্যারের সঙ্গী হই। সঙ্গে ড. ইয়াসমীন ম্যাডাম। সাক্ষাৎকারটি নেন NHK বাংলা বিভাগের আঃ রাজ্জাক।

জাপানে একটি পারিবারিক আড্ডায় প্রিয় স্যার ও ম্যাডাম

সঙ্গে ছিলেন তনুশী গোলদার। সাক্ষাৎকার শেষে আমরা চারজন Harajuku-তে ঘুরতে বের হই।

বিকেলে তারা বাংলাদেশ দূতাবাস ভবন পরিদর্শনসহ রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে FCCJ (Foreign Coresspondents Club of Japan)-এর সম্মানিত সদস্য হয়ে টোকিওর বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ঘুরে বেড়ান। রাতে ডিনার। রাত দশটার সময় উদ্যোক্তাদের সঙ্গে মিলিত হন। জাপান সফরকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য সামান্য উপহার দেয়ার আয়োজন করা হয়েছিল আগে থেকেই এবং সম্পূর্ণ গোপনীয়তা বজায় রেখে। কারণ স্যারের সম্পূর্ণ নিষেধ ছিল উপহার সম্পর্কে। কাজেই সাহস পাচ্ছিলাম না। কাজী ইনসান, আজাদ ভাই, মুনীর হোসাইনসহ অনেকেই হাজির হন হোটেল কক্ষে স্যারকে বিদায়ী সাক্ষাতের জন্য। প্রবাস প্রজন্মের পক্ষে উপস্থিত ছিল রাহমান মাহিনুর ইফা এবং রাহমান আশিকুর হিরোআকি। কিন্তু কেউ সাহস পাচ্ছে না। অথচ বিভিন্ন কথা বলে ক্ষেত্র তৈরি করছে। ইফা এবং আশিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে বলল, স্যার, আমাদের জাপানে একটি নিয়ম হচ্ছে কেউ যদি কাউকে উপহার দিতে চায় তবে সেটা গ্রহণ করতে হয় এবং পছন্দ হোক বা না হোক সেটা নিষেধ করা যায় না। আমরা ভাবলাম এটাই মোক্ষম সুযোগ। তাই আর দেরি না করে ওদের মাধ্যমেই প্রবাস প্রজন্মের উপহারটি স্যারের হাতে তুলে দেয়া হয়। সামান্য উপহার দিতে পেরে আমরা ধন্য হই। অনেক রাত পর্যন্ত আমরা কথাবার্তা বলি। ইফা এবং আশিক জাপানিজ গান শুনায়। পরের দিন সকালে আসব বলে বিদায় নিই। কারণ পরের দিন স্যার জাপান ত্যাগ করবেন।

১৭ নবেম্বর খুব সকালে স্যারের কক্ষে হাজির হয়ে দেখি স্যার এবং ম্যাডাম তৈরি হয়ে আছেন। ইতিমধ্যে তারা প্রাতঃরাশও সেরে ফেলেছেন। লাগেজ নিয়ে নিচে নামতেই দেখা হয় ড. খাদেমুল এবং ড. সঞ্জীব বড়ুয়ার সঙ্গে। তারা এসেছেন স্যারকে বিদায় জানানো এবং এয়ারপোর্ট পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার জন্য। স্যার তাদের দেখে অবাক হন।

১৭ নবেম্বর সবাই মিলে রওনা দিই নারিতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্দেশে। পথে স্যার বলে-কয়ে অযথা সময় নষ্ট না করার জন্য অনুরোধ করলে ড. খাদেমুল যাত্রাভঙ্গ করতে বাধ্য হন। ড. খাদেমুল বাধ্য ছাত্রের মতো স্যারের কথামতো নেমে যান। যদিও তিনি নিজেও একজন শিক্ষক।

স্যারদের যে যেতে দিতে হবে। কারণ স্যার যতদিন দেশের বাইরে থাকবেন ততদিনই দেশ এবং দেশের মানুষ স্যারের সৃষ্টিশীল কাজ থেকে বঞ্চিত হবে। তাই নিজেদের ভালোলাগা থেকে দেশের সার্বিক ভালোকেই প্রাধান্য দেয়া উচিত।

বিদায় জানানোর সময় শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে মাথা অবনত হয়ে এল। পা ছুঁয়ে ছালাম করার আগেই স্যার বুকে জড়িয়ে নিলেন খুব আপন করে। স্যারের কণ্ঠ যেন বন্ধ হয়ে এল। শুধু বলতে পারলেন মণি ভালো থেকো। একইভাবে ম্যাডামও। যতদূর দেখা গেল তাকিয়ে অবলোকন করলাম তাদের চলে যাবার দৃশ্য। হাত নেড়ে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছি। ভেতরটা হাহাকার করছে।

ড. সঞ্জীব বড়ুয়ার সঙ্গে টোকিওতে ফিরছি। এক ঘণ্টার জার্নি অনেক লম্বা লাগছে। অথচ স্যারদের সঙ্গে চার ঘণ্টার জার্নি মুহূর্তে শেষ হয়ে গেছে।

শেষ রাতে স্যারের ই-মেইল পেলাম। যাতে তিনি লিখেছেন 'ডিয়ার মণি, এইমাত্র আমরা বাসায় ফিরলাম। এখানে এখন মধ্য রাত। আগামীকাল সিলেট রওনা হব। ইফা, আশিকসহ সকল প্রবাসীকে আমাদের শুভেচ্ছা দিও। পরে ফোনে আলাপ হবে। ভালো থেকো। সবাইকে ধন্যবাদ।'

rahmanmoni@gmail.com